সমকাল

তারিখ ০৯ NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডাকসু নির্বাচন ও ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি

শিক্ষাঙ্গন | সারওয়ার মো. সাইফুল্লাহ খালেদ

অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার

স্বাধীনতা-উত্তরকালে এ দেশের ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন সূচিত হয়। ছাত্র রাজনীতি স্বাধীনতার আগেও ছিল; কিন্তু ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের সূত্র ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক পাল্টে যায়। ছাত্র-শিক্ষকরা নিজ নিজ পছন্দের রাজনৈতিক দলের অনুগামীদের চিনতে শেখেন। এর ফল জাতীয় জীবনে সুখকর হয়নি। এ ছাড়া সঙ্গত কারণেই দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে, যদিও এগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন আশানুরূপ হয়নি। সব মিলিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক ও এক্সট্রা-একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার মান নেমে গেছে। দেশের ছেলেরা উন্নত শিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে কিংবা দেশের ভেতর প্রশ্নবোধক মানসম্পন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ছুটছে। এর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান ছাত্র-শিক্ষক রাজনৈতিক কোন্দলও বহুলাংশে দায়ী।

রাজনৈতিক বিচারে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোয় এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (ডাকসু) নির্বাচন নিয়মিত হতো। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে আমি দেখেছি, এ হলে দুটি দলেরই প্রাধান্য ছিল। একটি ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রন্ট (এনএসএফ), অপরটি ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এপসু)। ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্রসংঘের কিছু সদস্য ছিল। হল নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো এনএসএফ এবং এপসুর প্রার্থীদের মধ্যে। দু'দলেই প্রচুর মেধাবী ছাত্র। আমি যে ক'বছর হলে ছিলাম (১৯৬৩-১৯৬৭), পরিচ্ছন্ন নির্বাচনে এ হলের ভিপি-জিএস পদসহ অনেক আসনে দুই প্যানেলের প্রার্থীদেরই পালাক্রমে জয়ী হতে দেখেছি। এনএসএফের দেশবরেণ্য অনেক বিশিষ্ট মেধাবী ছাত্রও নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। তবে যাদের কাছে পরাজিত হয়েছেন তারাও কম যান না। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর বিশেষত ভিপি-জিএস পদের জন্য তুখোড় মেধাবী ছাত্রদের বেছে নিত, যাদের অনেকেই পরবর্তী জীবনে হয় পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেছেন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছেন। আদু ভাইদের উৎপাত তখন ছিল না।

রাজনীতিকরা রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে দেশ গড়ার যথার্থ কর্মীকে তার কর্মের স্বীকৃতিদানকে যত বড় করে দেখতে শিখবেন, দেশ তত দ্রুত অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। এমন হলে নিবেদিতপ্রাণ দেশকর্মীকে রাজনীতিকদের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না। নিজেরাই কর্মে উদ্যোগী হবেন। 'রাজনীতি নয়; কর্মই সাফল্যের মাপকাঠি'– এ ধারণা দেশকর্মীর মনে যতই বদ্ধমূল হবে, দেশ তত দ্রুত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে। দুর্নীতি হবে না, চাটুকারিতা থাকবে না

রাজনৈতিক পরিচয় আড়াল করার উদ্দেশ্যে হলো নির্বাচন অবশ্য এপসু বা এনএসএফের ব্যানারে হতো না। এপসু সমর্থিত প্রার্থীরা 'প্রগতি' ও এনএসএফ সমর্থিত প্রার্থীরা 'অগ্রদূত' ব্যানারে নির্বাচন করতেন। প্যানেল্ল দুটি এ নামেই প্রচার লাভ করত। প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারে এ দু'নামই ব্যবহার করতেন। কোনো প্রার্থী নিজেকে এনএসএফ বা এপসুর প্রার্থী বলে পরিচয় দিতেন না। কোন প্যানেলকে কোন ছাত্র সংগঠন সমর্থন দিচ্ছে তা অবশ্য সবারই জানা থাকত। নির্বাচনে কোন্দল হতে দেখিনি। সুশৃঙ্খলভাবেই নির্বাচন হতো। নির্বাচনের দিনের আগ পর্যন্ত প্রায় সপ্তাহব্যাপী সন্ধ্যার পর নির্বাচন প্রচারণার পৃথক মঞ্চ থেকে উভয় পক্ষের নেতারাই ঝাঁঝালো বক্তৃতা দিতেন। এর সবই হলের সাধারণ ছাত্ররা উপভোগ করতেন। নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক; সবাই তা মেনে নিতেন। কোনো গোলযোগ হতো না। এখন অবশ্য দিন পাল্টে গেছে। সরকারি কলেজগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে।

সে সময়ে ডাকসুতে সরাসরি নির্বাচন হতো না। ডাকসুর ছাত্র প্রতিনিধিও প্রতি হলের ছাত্রদের প্যানেল থেকেই নির্বাচিত হতেন। প্রত্যেক হল থেকে একজন ডাকসু প্রতিনিধি নির্বাচিত হতেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে তাদেরই ভোটে ডাকসুর ভিপি-জিএসসহ অন্যান্য পদ পূরণ হতো। বিভিন্ন হল থেকে নির্বাচিত এসব ছাত্র প্রতিনিধি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাদের অনেকেই জাতীয় রাজনীতিতে যোগদান করেছেন এবং এখনও সক্রিয়। সে সময় ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকলেও ওগুলো আজকের মতো কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করত না। যদিও কোনো কোনো ছাত্র সংগঠন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। এখন তা এর প্রায় ১০ গুণ। হলের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। সরাসরি ডাকসু নির্বাচন এখন এলাহি কাণ্ড। যে কারণে প্রায় দু'যুগ ধরে ডাকসু নির্বাচনই হচ্ছে না। হলগুলোতেও নির্বাচন হয় না। ব্যাপারটা যেহেতু রাজনৈতিক, এর ভেতরে গূঢ় রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বারকয়েক সরাসরি ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। এখন আর হচ্ছে না যদিও বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট এবং শিক্ষক সমিতি নির্বাচন নিয়মিত হয়ে থাকে। সরকারি কলেজগুলোতেও তাই। ছাত্র রাজনীতির দাপট আছে কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচন নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের রাজনীতিকরা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছেন। এর ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা ১৯৭৩-পূর্বকালে রাজনীতির সঙ্গে আজকের মতো সরাসরি জড়িত ছিলেন না। কোনো একজন শিক্ষক কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে যতই পাণ্ডিত্য অর্জন করুন না কেন, এটা নিয়ে তাকে রাজনীতির মঞ্চে ওঠার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। যদি সে বিষয়ে রাষ্ট্রনায়কদের কোনো পরামর্শের প্রয়োজন পড়ে তবে তারা তার পরামর্শ নেবেন। শিক্ষক তার বিষয়ের একাডেমিক চর্চা তার নিজস্ব ছাত্রদের গণ্ডির ভেতরেই ছাত্রদের একাডেমিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখবেন। ছাত্র যতদিন ছাত্র আছে, একাডেমিক প্রয়োজনেই সে জ্ঞান ব্যবহার করবে। কর্মজীবনে কর্মে। কর্মজীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য সর্বক্ষেত্রেই রাজনীতি করতে হবে বা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগামী হতে হবে– এটা কর্মীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ক্ষতিকর। এতে দেশ ও জাতি উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে দেশ গড়ার কর্মী তৈরি হবে না; শুধু রাজনীতি আশ্রিত স্বার্থান্বেষী ফাঁপা কর্মী তৈরি হবে। আজকের মতো তখন এমন দলীয়করণ ছিল না।

পদার্থবিদ্যা বা অন্য কোনো বিষয়ের একজন শিক্ষক যদি মনে করেন, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুগামী না হলে তার অধীত বিদ্যার জ্ঞান ও সাধনা উভয়ই মাটি হবে, তবে তিনি অধীত বিদ্যার জ্ঞান ও সাধনা উভয়ই মাটি করে হলেও কোনো না কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের ব্যানারের তলে ভিড়ে যাবেন। যেমনটা আজকাল হচ্ছে। এটা শিক্ষকের অধীত বিদ্যা ও রাজনীতি উভয়ের জন্যই ক্ষতি তো বটেই, দেশের অগ্রগতির পথেও মারাত্মক বাধা। এ রকম হলে দেশ কোনোদিক দিয়েই অগ্রসর হবে না। দেশের জনগণকে রাজনীতিমনস্ক না করে যত বেশি কর্মমনস্ক করা যায়, ততই দেশের জন্য মঙ্গল। জনগণ যদি বোঝে– রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও কাজের যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্বীকৃতি ও যোগ্য মর্যাদা পাওয়া যাবে, তবে জনগণ কাজেই মনোনিবেশ করবে। রাজনৈতিক আশ্রয়ের সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটবে না। কিন্তু কষ্টার্জিত স্বাধীনতার পর থেকে সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। দেশপ্রেমে ভাটা পড়ল। সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, বৈষম্য, হানাহানি, খুনখারাবি বেড়ে গেল।

রাজনীতিকরা রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে দেশ গড়ার যথার্থ কর্মীকে তার কর্মের স্বীকৃতিদানকে যত বড় করে দেখতে শিখবেন, দেশ তত দ্রুত অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। এমন হলে নিবেদিতপ্রাণ দেশকর্মীকে রাজনীতিকদের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না। নিজেরাই কর্মে উদ্যোগী হবেন। 'রাজনীতি নয়; কর্মই সাফল্যের মাপকাঠি'– এ ধারণা দেশকর্মীর মনে যতই বদ্ধমূল হবে, দেশ তত দ্রুত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে। দুর্নীতি হবে না, চাটুকারিতা থাকবে না। রাজনৈতিক আনুগত্যে লালিত অযোগ্য লোকেরা পিছু হটতে বাধ্য হবে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে রাজনীতি, শিক্ষা ও কর্ম– সবই শক্তিশালী হবে।